মো. মাহবুবর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান

[আগের সংখ্যার পর]

৪. মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংগ্রহশালা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংকলিত ডকুমেন্টস গ্রন্থ

৪.ক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

৪-ক. (১) জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ' নামক একটি কমিটি গঠন করে। গঠনের এক বৎসরের মধ্যেই কমিটি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ৪১৪১ জন ব্যক্তির সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। তাছাড়া কমিটি ৩৫০ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ, ১৯৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংবাদকর্মী প্রভৃতি শ্রেণী-গোষ্ঠির ৪৯৫ জন সদস্যের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। উক্ত কমিটি সংবাদপত্র থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু বছর শেষে অজ্ঞাত কারণে কমিটি কাজ বন্ধ করে দেয় এবং সংগৃহীত দলিলপত্র বাংলা একাডেমীর কাছে হস্তান্তর করে।

৪.ক.(২) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র;* মোট ১৫ খণ্ড, ঢাকা: তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৭ সালে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে। দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে (১৯৭৭ সালের ১লা জুলাই থেকে) নিয়োগ দিয়ে

প্রকল্পটি দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রকল্পের আওতার সংগৃহীতব্য দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন।

প্রকল্পের জনবল ছিল প্রকল্প পরিচালকসহ মাত্র ৫ জন। সময়-সীমাও ছিল সীমিত, মাত্র ৫ বৎসর। এই অবস্থায়ও তাঁরা বিশাল কাজটি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন, একথা নি:সন্দেহে বলা যায়। এই প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত করেছেন। তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন:

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা। কিন্তু দু:খজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে - কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসাবে আমরা দু'টি বিষয় লক্ষ করেছি: প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কম সংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায়। আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশংকা, তা আমাদের দলিল-খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই আমাদের দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত

দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি - অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি, ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ একথাও সত্যি যে, স্বাধীনতা সংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সঙ্গে আমরা দুঃখের সাথে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। (*বাংলাদেশের স্বাধীনতা দলিলপত্র খণ্ড-১*, পৃ. ছয়-সাত)

নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রকল্পের আওতায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ১৯৭২ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদের কমিটির সংগৃহীত দলিলপত্রও রয়েছে। মোট সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠা দলিল সংগ্রহ করেও প্রকল্পের কর্মীগণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এর বাইরেও অসংখ্য দলিল অসংগৃহীত থেকে গেছে। প্রকল্প পরিচালক লিখেছেন:

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে। শেষ সীমার পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন। (ঐ, পৃ. ছয়)

প্রকল্পটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার উদ্দ্যেশ্যে গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত ইতিহাস রচনার পরিবর্তে সংগৃহীত দলিলপত্র সংকলন আকারে হুবহু প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয়:

সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের

মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দূরূহ। এজন্যেই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সঙ্গতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। (ঐ, পৃ. তিন)

এভাবে মূল পরিকল্পনায় ৭,২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হওয়ায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠা দলিল ১৫ খন্ডে মুদ্রণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খণ্ডগুলি নিম্নরূপভাবে বিষয়ভিত্তিক সাজানো হয়:

প্রথম খণ্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ড : মুজিব নগর: প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ড : মুজিব নগর: প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ড : মুজিব নগর: বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ড : মুজিব নগর: গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র (সরকারী ও বেসরকারী)
অষ্টম খণ্ড : গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খণ্ড : বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ড : সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ড : কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

দলিলপত্র খণ্ডভিত্তিক বিন্যস্ত করার পেছনে বিবেচ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ:

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অংগুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা

শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহু ক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি-এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রমাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে-সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন, কিছু নতুন দলিলও তথ্য, যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী, তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমসিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের যে ১৫টি খণ্ড সেসময় প্রকাশ করা হয়েছিল তা' মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সেসময় যদি করা না হতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা আজ কেবল দূরুহই হতো না, অসংখ্য বিতর্ক সৃষ্টিরও সুযোগ হ'তো।

মনে রাখতে হবে, ১৯৭৮-৮১ সময়কালে সংগৃহীত সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠা দলিলের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩,৩৫,০০০ পৃষ্ঠা দলিল কেন যে অপ্রকাশিত এবং অদৃশ্যে থেকে গেল তা'র কারণ আজো অজ্ঞাত।

সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠা দলিলের মধ্য থেকে ১৫ খণ্ড সংকলনের জন্য বাছাই করা পনের হাজার পৃষ্ঠা দলিলের মূল্য ও গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পনের খন্ডের শিরোনাম এবং প্রতিটি খন্ডের সূচিপত্র পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সবগুলো দিক (aspects) সম্পর্কে কমবেশি ডকুমেন্টস পনের খন্ডের মধ্যেই সংকলন করা হয়েছে।

৪.ক.(৩) মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক প্রকল্প

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে 'মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ১৮,০০০ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল। প্রকল্প কমিটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যসহ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ও অন্যান্য ডকুমেন্টস সংগ্রহ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর প্রকল্পটি বাতিল করা হয়। সংগৃহীত ডকুমেন্টস সেনা বাহিনীর আরকাইভসে সংরক্ষিত আছে বলে জানা গেছে। পরবর্তীকালে ৭ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৪.ক.(৪) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস (সাবেক ইপিআর) এর ভূমিকা শীর্ষক প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস এর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। বিডিআর কর্তৃপক্ষ ১৯৭৪ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিডিআর বাহিনীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। ১৯৭৩ সালে পীলখানায় একটি ক্ষুদ্র 'ইতিহাস সেল' গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালের মধ্যে গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি প্রণীত হলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ করা যায়নি। অবশেষে ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ১৯৯৯ সালে 'মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য

বাহিনী' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য : সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

৪.ক.(৫) মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবদান নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সাল হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং ২০০০ সালে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এএসএম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, ঢাকা: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ২০০০। আলোচ্য গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের অবদানের উল্লেখ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের জীবনী ও তাঁদের যুদ্ধ ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদ পুলিশ সদস্যদের জীবনী যুদ্ধ ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খেতাবপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের জীবনী ও যুদ্ধ ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের সমাধিস্থলের তালিকা প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক দলিল হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। গ্রন্থটির পরিশিষ্ঠ অংশকে (পৃষ্ঠা ৪১১-৪৯৫) মুক্তিযুদ্ধের দলিলের সংকলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পরিশিষ্টগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

পরিশিষ্ট ১ : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক অফিসারগণের নাম।
পরিশিষ্ট ২ : মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর বাহিনীর যাঁরা শহীদ হয়েছেন।
পরিশিষ্ট ৩ : মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর বাহিনীর যাঁরা বিভিন্ন পদক পেয়েছেন।

৪.ক.(৬) মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক প্রকল্প

আনসার বাহিনীর ৪০ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করেন। আনসার কমান্ডার ও প্রশিক্ষকরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন। এ যুদ্ধে শহীদ হন বাহিনীর ১৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫৭ জন আনসার সদস্য। ২০০২ সালে আনসার বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ভূমিকা লিপিবদ্ধ করার কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে সারাদেশ থেকে জেলাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ড. শেখ গাউস মিয়া রচনা করেন *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী*, (ঢাকা: জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০০৯)। গ্রন্থটির শেষাংশে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা' মুক্তিযুদ্ধের দলিল হিসেবে গণ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য দলিল হচ্ছে:

১. মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত এবং মুজিবনগরে ১৭ই এপ্রিল গার্ড অব অনার প্রদানকারী আনসারবৃন্দের তালিকা
২. শহীদ আনসার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা
৩. পিসি, এপিসি ও আনসার তালিকা (জেলাভিত্তিক)

৪. যুদ্ধাহত আনসার মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকা
৫. মুক্তিযোদ্ধা আনসার ভিডিপি-র স্থানীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী
৬. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সদস্যদের তালিকা (জেলাভিত্তিক)।

পরবর্তীকালে মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় রচিত হয় *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী* (রচনায় মো. মাহবুবর রহমান ও মীর ফেরদৌস হোসেন), ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৩।

৪.ক.(৭) মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

এই ট্রাস্টের উদ্যোগে ৫০০ শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত— 'যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ' শিরোনামে আসাদ চৌধুরী ও এনামুল কবির এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৪.খ গ্রুপ কিংবা ব্যক্তি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠন

সরকারি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংগ্রহের উদাসীনতা লক্ষ্য করে কিছু ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী সে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.খ.(১) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা (Liberation War Museum, Dhaka)

১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকা শহরে সেগুন বাগিচায় আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে বেসরকারিভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত। এর লক্ষ্য হচ্ছে:

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম-জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়- বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

এই জাদুঘরে সংগ্রহ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র দলিলপত্র, পত্র-পত্রিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত সামগ্রী, শহীদদের স্মৃতি চিহ্ন ইত্যাদি। এগুলো জাদুঘর চত্বরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। ২০০৮-০৯ -এ প্রায় ৩৬,০০০ দর্শনার্থী জাদুঘরে এসেছেন। ১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ঢাকায় দুটি বধ্যভূমি খনন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ উৎসব ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

৪.খ.(২) মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র (Liberation War Research Center)

১৯৯০ সালের ৯ই মার্চ ঢাকায় মতিঝিলে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সরকারি ও বেসরকারি ডকুমেন্ট, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের রিপোর্ট, চিঠিপত্র, দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই কেন্দ্র থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৪.খ.(৩) স্মৃতি সংসদ (Memorial Association)

১৯৮৪ সালে ঢাকার কাফরুলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল সংগঠক ছিলেন এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন। এই সংগঠনের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী দালাল-রাজাকার প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি তথ্যবহুল বই প্রকাশিত হয়েছে।

৪.খ.(৪) মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র (Centre for Spreading the Spirit of Liberation War)

এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী দালালদের তালিকা প্রস্তুত করা। ১৯৬৮ সালে এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় 'একাত্তরের খুনী-দালালরা কে এবং কোথায়?' ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রটি প্রকাশ করে 'একাত্তরের ঘাতক জামায়াত ইসলামীর অতীত ও বর্তমান'।

৪.খ.(৫) মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ

মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের ন্যায় এই সংগঠনটি ৬০০ দালালের তালিকা ও পরিচিতি সংবলিত গ্রন্থ 'একাত্তরের দালালেরা' প্রকাশ করেছে।

৪.খ.(৬) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র ২০০০ সালে 'মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

৪.খ.(৭) মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস প্রকল্প

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এই প্রকল্পের প্রণেতা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের উপজেলাভিত্তিক ইতিহাস পুনর্গঠন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্থানীয় শিক্ষক-সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা প্রমূখের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের উপজেলাভিত্তিক ইতিহাস প্রণয়ন করছেন। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪.খ.(৮) জেলায় জেলায় মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা পরিষদ ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাশহরে (যেমন চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সুনামগঞ্জ ইত্যাদি) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যেমন : ১৯৭২ সালের ২৫শে এপ্রিল দিনাজপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুক্তিসংগ্রামে দিনাজপুরের ভূমিকার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ পরিষদ'। ১৯৮৯ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা কমিটি'। এসব স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কোথাও কোথাও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহশালাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে। এখানে সংবাদপত্র থেকে মুক্তযুদ্ধভিত্তিক পেপার কার্টিং করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা ইতোমধ্যে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও আর্কাইভস, কেন্দ্রীয় জাদুঘর (শাহবাগ, ঢাকা), ন্যাশনাল আরকাইভস (আগারগাঁও, ঢাকা), যশোর সেনানিবাস জাদুঘর (পৌর ক্যান্টন), রংপুর সেনানিবাস জাদুঘর) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪.খ.(০৯) হেরিটেজ : বাংলাদেশের ইতিহাসের আরকাইভস রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাজলায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'হেরিটেজঃ বাংলাদেশের ইতিহাসের আরকাইভস' নামক সংগ্রহশালায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পত্রিকা, পুস্তিকা, স্মরণিকা ও জেলা-উপজেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সংগ্রহশালা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা যাবে।

৪.খ.(১০) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনতাসীর মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও দলিলপত্র সংগ্রহ

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মুনতাসীর মামুন ১৯৯৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট' স্থাপন করেছিলেন। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল 'নিয়মিত বক্তৃতার আয়োজন, জার্নাল প্রকাশ, উচ্চতর গবেষণার আয়োজন' ইত্যাদি। এই ইনস্টিটিউট বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চার কেন্দ্রের পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি (এপ্রিল ২০২১) এই ইনস্টিটিউটে

একজন পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

৪.খ.(১১) বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন কর্তৃক খুলনায় প্রতিষ্ঠিত '১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' এবং 'গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র'

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। ১৯৭৫ সালের পর মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, নির্যাতন প্রভৃতি শব্দগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের এবং নির্যাতনের কথা মানুষ ভুলতেই বসেছিল। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বধ্যভূমি ও গণকবরের চিহ্নও মুছে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় গণহত্যা-বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরির জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকে প্রফেসর মুনতাসীর মামুন ১৭ই মে ২০১৪ তারিখে খুলনায় প্রতিষ্ঠা করেন '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন, গণকবর ও জাদুঘর'। 'এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ'।

খুলনায় স্থাপিত এই জাদুঘরটি বাংলাদেশের এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর। বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জাদুঘরের জন্য এক খণ্ড জমি এবং ছয়তলা ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ অনুমোদন দিয়েছেন। উক্ত অর্থে এখন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। জাদুঘরটি বর্তমানে খুলনায় সোনাডাঙ্গায় একটি ভাড়া বাড়িতে চালু আছে।

সরকার ইতোমধ্যে ২৫শে মার্চকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গণহত্যা দিবস পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ফলে খুলনায় গণহত্যা জাদুঘরটির প্রতিষ্ঠা যৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, নির্যাতন তথা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রফেসর মুনতাসীর মানুন ২০১৭ সালে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গণহত্যা জাদুঘরের অধীনে 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে উক্ত কেন্দ্রের মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রফেসর মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে গবেষণা কেন্দ্রটি দেশব্যাপী গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ

নিয়ে নিবিড় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গণহত্যা জাদুঘরে ইতোমধ্যে একাত্তরের গণহত্যার অনেক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী খুলনাস্থ প্লাটিনাম জুট মিলের জ্বলন্ত বয়লারে মানুষ পুড়িয়ে মারা হতো। নিরীহ লোকদের প্রথমে জীবিত অবস্থায় বস্তায় ভরা হতো, তারপর সেই বস্তা পায়ের দিক থেকে জ্বলন্ত বয়লারে ঢুকানো হতো। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে নয় মাসে উক্ত বয়লারে অসংখ্য শ্রমিককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গণহত্যা আর নির্যাতনের স্বাক্ষী সেই বয়লারটির অংশবিশেষ গণহত্যা জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী সংগ্রহশালা'। জাদুঘরে গণহত্যার অসংখ্য আলোকচিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হচ্ছে। জাদুঘরের উদ্যোগে খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে নির্মিত গণহত্যার স্মৃতি ফলকসমূহ এখন গণহত্যার ইতিহাসের স্বাক্ষী।

গণহত্যা জাদুঘরের বহুবিধ কার্যক্রমের একটি হচ্ছে গণহত্যা 'নির্ঘণ্ট সিরিজ' বা 'জেনোসাইড ইনডেক্স' প্রণয়ন। একটি গণহত্যাকে কেন্দ্র করে মাঠ সমীক্ষা ও প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষের ভিত্তিতে রচনা করা হচ্ছে একটি গ্রন্থ। এ পর্যন্ত একশটি গণহত্যার ওপর ১০০টি নির্ঘন্ট গ্রন্থ[১] প্রণীত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে আছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণী, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। পুরো কাজটি গবেষণামূলক। এই কাজটি গণহত্যা-নির্যাতনের একাডেমিক ইতিহাস চর্চায় এনেছে নতুন দিগন্ত।

ওই জাদুঘরের উদ্যোগে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নির্যাতন কেন্দ্রের জেলা জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩০টি জেলার জরিপ প্রতিবেদন[২] প্রকাশিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত গবেষকরা প্রতিটি গ্রাম ঘুরে শনাক্ত করেছেন একাত্তরের নির্মম ইতিহাস। জেলা জরিপের চিহ্নিত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর স্থানের জিপিএস লোকেশন নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বধ্যভূমি ম্যাপ। গুগল ম্যাপের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে সারা বাংলাদেশের বধ্যভূমির মানচিত্র।

জাদুঘরে বিপুল তথ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে ডিজিটাল আর্কাইভ। সেখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে একাত্তরের গণহত্যার দেশি-বিদেশি দলিল ও পত্র পত্রিকা। আর্কাইভে ইতোমধ্যে প্রায় ৭০০০ গণহত্যার ছবি সংগৃহীত হয়েছে। একাত্তরে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত ২২টি পত্রিকা

আর্কাইভে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রায় সব বই সংগ্রহ করা হয়েছে লাইব্রেরিতে। এখানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুর্লভ দলিলপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুলনাস্থ জাদুঘরের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ গবেষকদের সম্মাননা প্রদান, শহীদ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা, মুনতাসীর মামুন-ফাতেমা ট্রাস্ট কর্তৃক দুস্থ বীরাঙ্গনা ও শহীদ পরিবারকে অনুদান প্রদান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন, বিভিন্ন ডকুমেন্টারি তৈরি, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশে তরুণ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক তৈরি করার লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সবাইকে জানানোর জন্য জাদুঘরের ভিতরে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অংশ গণহত্যা-নির্যাতনের ওপর রচিত বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের প্রায় সকল বই রয়েছে। এই গ্রন্থাগারে রয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণহত্যাসহ বাংলাদেশের গণহত্যার ওপর রচিত দুষ্প্রাপ্য অনেক বই।

এভাবে খুলনাস্থ জাদুঘরটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে।

৪.খ.(১২) মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি*, ৫ খণ্ড, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ সেটটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে সম্পাদিত পঞ্জিগ্রন্থ। পঞ্জিগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুদ্ধ ঘটনার বিবরণ, স্মৃতি কাহিনী সংকলন করে। এই পঞ্জি রচনার জন্য ছয়টি পত্রিকা বেছে নেয়া হয়েছিল, সেগুলি হলো— *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক বাংলা*, *দৈনিক বাংলার বাণী* এবং *দৈনিক পূর্বদেশ*। পত্রিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন—

প্রথম তিনটি পত্রিকাই এ অঞ্চলের পুরনো পত্রিকা। অপেক্ষাকৃত নতুন দৈনিক ছিল *দৈনিক বাংলা* যা প্রতিনিধিত্ব করতো সে সময়ের তরুণ বা 'আধুনিক'দের। সে তুলনায় পূর্বদেশ বা *দৈনিক বাংলার বাণী* ছিল একেবারে নতুন। এভাবে, বিভিন্ন মনোভঙ্গির পত্রিকার উপাদান তুলে ধরতে চেয়েছি। *আজাদ* মূলত ঃ মুসলিম লীগের পত্রিকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু, প্রগতিবাদী অনেকে তখন কর্মরত ছিলেন আজাদে। *সংবাদও* ছিল মুসলিম লীগের কিন্তু, তখনও কেউ, এবং এ পর্যন্ত *সংবাদ*-কে প্রগতি বিরুদ্ধ কাগজ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেনি। *ইত্তেফাক* ছিল আওয়ামী লীগ ঘেঁষা এবং ১৯৬৬ থেকে এ পত্রিকায়ই স্বদেশিকতার বাণী সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা

হয়েছে। *দৈনিক বাংলা* ছিল সরকারি পত্রিকা তবে এর সাংবাদিকরা ছিলেন বাংলাদেশের তরুণ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রগতিবাদী যদিও চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অনেক বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হতো। *পূর্বদেশ* ছিল স্বাধীনতা বিরোধী। হামিদুল হক চৌধুরী এবং এর কয়েকজন কর্মচারী বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। *বাংলার বাণীর* মালিক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, আওয়ামী লীগের তরুণ তুর্কি। [*মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি-১*, পৃ. ৭-৮]

এই পঞ্জি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন—

কী ধরনের উপাদান আছে পত্রপত্রিকায় তা দেখার কৌতূহল থেকেই এ পঞ্জি রচিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, গবেষকদের বা সাধারণ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা যে, কী কী বিষয়ে লেখা হয়েছে সংবাদপত্রে, কী আছে তাতে? সামগ্রিক বা আঞ্চলিক কোনো ইতিহাস লিখতে গেলেও এ উপাদানসমূহ কাজে লাগতে পারে।... [ঐ, পৃ. ৬-৭]

মুক্তিযুদ্ধপঞ্জির সময়কাল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫। এই সময়কাল বেছে নেওয়ার কারণ—

মুক্তিযুদ্ধপঞ্জির সময়কাল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫। ১৯৭১ এর পুরো সময়টি নয়। ১৯৭১ এর বিজয় দিবস থেকে শুরু। ১৯৭৫ এ শেষ। এ সময়টুকু বেছে নেয়ার কারণ আছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়ে কোনো অবান্তর প্রশ্ন করার সাহস কারো হয়নি। ঐ সময়ের স্মৃতি ছিল প্রখর, রং চড়াবার অবকাশ ছিল কম, আবেগের ভাগটি ছিল অবশ্য বেশি। ঐ সময় যখন কেউ আবেগের কথা বর্ণনা করেছেন বা যুদ্ধের, বা তুলে ধরেছেন গণহত্যা বা বধ্যভূমির চিত্র তাতে অতি অতিরঞ্জন, বিকৃতি, উপেক্ষা কিছুই স্থান পায়নি। সুতরাং উপাদান হিসেবে এসব প্রতিবেদন/ রচনার গুরুত্ব অনেক বেশি। [ঐ, পৃ. ৭]

১৯৭৫ পরবর্তী পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংবাদ, ফিচার বা প্রবন্ধের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন:

১৯৭৫ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রতি বছরই মার্চ এবং ডিসেম্বরে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপাদান হিসেবে এগুলির মূল্যও কম নয়। কিন্তু, এসব রচনা বা উপাদান ব্যবহারের আগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, লেখকের মনোভঙ্গি জানতে হবে এবং তারপর এর যথার্থতা বিচার করতে হবে। যেমন, জামাতের নেতা বা তাদের প্রকাশনা/পত্রিকায় তো এখন বলা হচ্ছে ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বরের ঘটনা বা বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বিষয়টি আওয়ামী লীগেরই কীর্তি। বিএনপির প্রতি যাদের ঝোঁক, তাদের অনেকের লেখাই দেখা যাচ্ছে ২৬ মার্চ জিয়াউর

রহমানের কণ্ঠে তারা স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান শুনেছিলেন। এর আগে, কখনও তা শোনেন নি। [ঐ, পৃ. ৭]

পাঠক/গবেষকদের সুবিধার জন্য আমরা এই ছয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাবতীয় প্রতিবেদন, রচনা সবকিছু কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। সেগুলি হলো— মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধাপরাধী বিচার, রণাঙ্গন, রাজাকার, ১৬ ডিসেম্বর, সশস্ত্রবাহিনী, স্বীকৃতি, অস্ত্রসমর্পণ, আটক বাঙালি, উদ্বাস্তু, বিশ্বপ্রতিক্রিয়া, উপ-সম্পাদকীয় [বিভিন্ন বিষয়ে] ইত্যাদি।...

প্রতিবেদনগুলি ভাগ করা হয়েছে ছয় ভাগে— কালরাত্রি, খানসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞ/বর্বরতা, গণহত্যা, দালাল, আলবদর ও যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার, নির্যাতিতা নারী ও বধ্যভূমি। [ঐ, পৃ. ৯]

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তালিকা আছে।

মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জিতে কী ধরণের তথ্য আছে তার একটি নমুনা হিসেবে আমরা মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি-১ থেকে রাজশাহী জেলার উপর প্রদত্ত ভুক্তিগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

জল্লাদ বাহিনীর হত্যা লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ধ্বংস), *দৈ. আ.*, ০৭.০২.১৯৭২

বর্বর খান সেনারা রাজশাহী শহরে আড়াই হাজার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছে, *দৈ. পূর্ব.*, ২৫.০৯.১৯৭২

রাজশাহীর বাজার : হানাদাররা পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করেছে, *দৈ. পূর্ব.*, ১৫.১১.১৯৭২

এক রাতে নরওপশুরা ৫শ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। রাজশাহীর ২১টি পল্লীতে বর্বর বাহিনীর নির্যাতনের প্রাথমিক রিপোর্ট, *বাং. বা.*, ২১.০৫.১৯৭২

পাক বর্বরদের হাতে রাজশাহী পৌর এলাকায় ৩৭৭ জন নিহত হয়েছে, *দৈ. পূর্ব.*, ২৫.০৭.১৯৭২

রাজশাহীতে ৬ জন ছাত্রের লাশ উদ্ধার-বদর বাহিনীর আরেক কীর্তি, *দৈ. ই.*, ০১.০১.১৯৭২

রাজশাহীতে স্বাক্ষর অভিযান-বিশ্বসংস্থার প্রতি গণহত্যার বিচার দাবী, *দৈ. বা.*, ২০.০২.১৯৭২

হতভাগিনী ১১৬টি মহিলা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জোহা হল থেকে ১১৬টি মহিলার বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে), *দৈ. ই.*, ০৮.০১.১৯৭২

এই ঘাতককে ধরিয়ে দিন (আলবদর রাজশাহীতে), *দৈ. পূর্ব.*, ১৫.০৩.১৯৭২

খুন ও দালালীর দায়ে ৩ ব্যক্তির যাবজ্জীবন (রাজশাহীর), *বাং. বা.*, ২৯.০৮.১৯৭৩

জিল্লুর রহমান গ্রেফতার (রাজশাহীর আলবদর উপদেষ্টা), *দৈ. ই.*, ০২.০১.১৯৭২

দালাল বিচার ট্রাইব্যুনালের জন্য আরো কৌসুলী নিয়োগ (রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট জেলার দালাল বিচারের জন্য), *দৈ. সং.*, ১৭.০৪.১৯৭২

দালালির মামলায় যাদু মিয়ার মুক্তিলাভ (রাজশাহীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক), *বাং. বা.*, ১৯.০৮.১৯৭৩

মুক্তিযোদ্ধারা শেষ পর্যন্ত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদের লালন করছে কারা (পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যারা কাজ করেছিল তাদের সম্পর্কে লেখা), *দৈ. পূর্ব.*, ০৩.০৮.১৯৭২

রাকসুর প্রস্তাব-দালাল শিক্ষকদের বহিষ্কার করুন (এক সভায় একথা বলা হয় সভাপতিত্ব কনের রাকসুর পত্রিকা সম্পাদক জনাব ইব্রাহীম আজাদ), *দৈ. পূর্ব.*, ১০.০৮.১৯৭২

রাজশাহী জেলা হইতে ১৪৩ জন বন্দীর মুক্তিলাভ (দালাল আইনে আটক), *দৈ. ই.*, ০৮.১২.১৯৭৩

রাজশাহী জেলার ৭৮ জন দালালকে হাজিরের নির্দেশ (দালাল মামলায়), *দৈ. আ.*, ৩০.১১.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ : দালাল শিক্ষক-ছাত্র ও কর্মচারীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবী, *দৈ. পূর্ব.*, ১৮.০৪.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ : দালালদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবী, (রাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই দাবী করেছেন), *বাং. বা.*, ১৬.০৪.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ে ৬ দালাল অধ্যাপক গ্রেফতার, *দৈ. আ.*, ১৭.০৫.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল ছাত্র ও শিক্ষকদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনর দাবী, *দৈ. পূর্ব.*, ২১.০৪.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন দালার শিক্ষাবিদ গ্রেফতার, *দৈ. আ.*, ১৮.০২.১৯৭২

রাজশাহী ভার্সিটির দু'জন ছাত্র নেতার বিবৃতি : দালাল ছাত্র ও শিক্ষকদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে, *বাং. বা.*,

১৭.০৪.১৯৭২

রাজশাহীতে দালালের ৩ বৎসর কারাদণ্ড (আজিজুর রহমান), *দৈ. আ.*, ২৯.০৮.১৯৭৩

রাজশাহীতে পুলিশী তৎপরতা। কিছু সংখ্যক দালাল ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার, *বাং. বা.*, ০৭.০৮.১৯৭২

হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি দাবী : রাজশাহী ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি সভা, *দৈ. আ.*, ৩১.১২.১৯৭১

বীরাঙ্গনা (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান ঘোষণা দেন যে যারা ৯ মাস পাকিস্তানের কাছে আটক ছিল তারা সকলেই বীরাঙ্গনা মর্যাদা পাবে), *দৈ. পূর্ব.*, ২৩.১২.১৯৭২

ভারতীয় চরদের হাতে মহিলাদের লাঞ্ছনা (রাজশাহীতে), *দৈ. আ.*, ১৪.০৯.১৯৭১

ভারতীয় চরেরা এখন মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে (রাজশাহীর কানসাট গ্রাম), *দৈ. পাক.*, ১৪.০৯.১৯৭১

ওরা হাত বেঁধে হত্যা করতো, রাজশাহীতে ইটের খোলায় আরেকটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত, *বাং. বা.*, ০১.০৫.১৯৭২

পাঁচ হাজার নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে (রাজশাহীতে ১৫টি গণ সমাধি আবিষ্কৃত), *দৈ. আ.*, ২৪.০২.১৯৭২

রাজশাহীতে আরও একটি গণকবর আবিষ্কৃত, *দৈ. ই.*, ০৩.০১.১৯৭২

রাজশাহীতে আরও একটি গণকবর আবিষ্কৃত, *বাং. বা.*, ০৫.০৫.১৯৭২

রাজশাহীতে আরও একটি গণকবর আবিষ্কৃত, *দৈ. বা.*, ১৬.০৫.১৯৭২

রাজশাহী পশু বাহিনীর আরেক স্বাক্ষর— একশ গণকবরে ১০ হাজার নরকঙ্কাল, *দৈ. আ.*, ০৫.০৫.১৯৭২

রাজশাহীতে বধ্যভূমি : হানাদার বাহিনী এখানে দশ হাজার লোককে হত্যা করে, *দৈ. ই.*, ০৬.০৫.১৯৭২

হানাদার বাহিনী এখানে ১০ লোক হত্যা করে (রাজশাহীতে একটি বধ্যভূমির সন্ধান প্রসঙ্গে), *দৈ. সং.*, ০৭.০৫.১৯৭২

৪.খ.(১৩) মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ১২ খণ্ড, ঢাকা : সময়, ২০১৩।

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি কোষগ্রন্থ জরুরি— এই দায়িত্ববোধ থেকে মুনতাসীর মামুন ১২ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ কোষ সংকলন করেন। এই কোষগ্রন্থের পটভূমি ১৯০৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডের বিষয় ঘটনা ও ব্যক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের [পটভূমিসহ] সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা এবং এর সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট প্রয়াত ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সামরিক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া [এই এক খণ্ডে]। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ৭ মার্চের বক্তৃতা যেমন আছে, তেমনি আছে 'মোছুয়া' বা 'মুছুয়া'র ওপরও ভুক্তি। ওয়াহিদুল হক যেমন আছেন, তেমনি আছেন মনিসিংহও। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের বিষয় স্বাধীনতা বিরোধী। এতে রাজাকার, আলবদর, আলশাসম, মুজাহিদ, শান্তি কমিটির সদস্য, রাজনৈতিক নেতা কর্মী সবাইকে এক কথায় যারাই মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতা করেছে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড- যুদ্ধ। পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের বিবরণ। নবম, দশক ও একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড শহিদদের নিয়ে।

ভুক্তি লিখে দেয়ার জন্য লেখকের অভাব উপলব্ধি করে যেসব ভুক্তির জন্য যথাযথ রচনা পাওয়া গেছে সেগুলি এবং নতুনভাবে লিখিয়ে নেয়া— এ দুইয়ের সংকলন করে কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ, রচনা, প্রতিবেদন। এর একটা যুক্তি এই যে নতুনভাবে লিখলেও তাকে একই উৎস ব্যবহার করতে হবে এবং অধিকাংশ ভুক্তির ক্ষেত্রেই গভীর গবেষণার জরুরি নয়। এভাবে ভুক্তি পূরণের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "যে সব বই থেকে সংকলন করা হয়েছে তাঁদের অনেকের কাছ থেকে আমরা অনুমতি গ্রহণ করেছি। কিন্তু, অনেকের কাছে থেকে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, স্থানীয়ভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক বই বেরিয়েছে, বা কোনো একটি সংস্থা/প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারপর উঠে গেছে। এরকম অনেক ব্যক্তি/সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। প্রকাশিত ঠিকানায় ব্যক্তি/সংস্থাকে পাইনি। এই অক্ষমতা আশা করি লেখকরা (যাঁদের অনুমতি ছাড়া লেখা সংকলিত হয়েছে) আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। আরেকটি কারণে তারা আমাদের ক্ষমা করতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধ চর্চা বা চেতনা সমুন্বত রাখার জন্যই তারা লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধ ভালোবাসেন দেখেই *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* লিখেছেন। আমরাও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করছি এবং ভুক্তিগুলিতে লেখকের নামও আছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ভুক্তির শেষে উৎসও বর্ণিত হয়েছে। নতুনভাবে অনেকে লিখে দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা উৎস উল্লেখ করেননি। লেখাটি তাঁর অভিজ্ঞতাজাত সাধারণ বিষয় (কিন্তু উৎস থেকে অনেক)। উৎসের ক্ষেত্রে কয়েকটি ভুক্তির বিষয়ে শুধু এ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে। বানানের ক্ষেত্রে সমতা রাখা সম্ভব

হয় নি বিশেষ করে। 'ি' ও 'ী' ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কারণ, অনেকে পুরনো বানান ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অবশ্য দু'টিই শুদ্ধ।

প্রতিটি ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রথমে শিরোনাম, রচনা, ডানদিকে লেখকের নাম, নাম না থাকলে 'সংকলন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাঁ দিকে উৎসের ক্রমিক নাম্বার। এ ক্ষেত্রে নির্দেশিকা প্রথমে অভিধানিকভবে সাজালেও পরে আর সে ক্রম রক্ষা করা যায়নি।

৪.খ.(১৪) মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১১

গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের মূল দলিলপত্রের সংকলন গ্রন্থ। বিভিন্ন সংগ্রহে আগোচরে থাকা ছোট ছোট দলিলগুলি সংগ্রহ করে মুনতাসীর মামুন এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করার মাধ্যমে দলিলগুলিকে রক্ষা করেছেন। দলিলগুলি দৈনিক জনকণ্ঠে ৬০ কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনগর্ঠনে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সহায়ক হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলের শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা হ'লো:

নিয়াজীর চিঠিতে গণহত্যার নীলনক্সা, শান্তিসেনা ও তাদের হলফনামা, শান্তিকমিটির আবেদনপত্র, বাগেরহাটের এক শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের 'জরুরী আবেদন', কুড়িগ্রামের শান্তি কমিটি হিন্দু সম্পত্তি দখলে নিত, হুমকি দিয়ে লিফলেট জামালপুর শান্তি কমিটির, মুক্তিযুদ্ধে মুক্তাঞ্চলের একটি মুচলেকা পত্র, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার আহ্বান, শান্তিকমিটির লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ডের চিত্র, পাকিস্তানী জেনারেলদের ভাষ্য এবং নিয়াজীর একটি মেমো, জামায়াতের জনসভা পাকিস্তানের পক্ষে, যশোর জেলা শান্তি কমিটির সভা, জিয়ার দেয়া স্বাধীনতার চতুর্থ ঘোষণার দু'টি খসড়া, ৭১-এ এম.এ. হান্নান ও শাজাহান সিরাজের লেখা চিঠি, লণ্ডনের বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি ও তাদের পত্রিকা, একাত্তরের শান্তি কমিটির নরহত্যার পেছনে ছিল জামায়াত, ৭১-এর 'মুক্তি'র সব কপি ৭৫-এর পর পুলিশ গায়েব করে, '৭১-এর অক্টোবরে প্রচন্ড মার খায় রাজাকাররা, রাজাকারদের আহ্বানে '৭১-এর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যায়নি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সেদিন হাতে লিখেও প্রচার হতো লিফলেট, 'বিসমিল্লাহ' বলার পরও গুলি, শান্তি কমিটির বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে, একজন যুদ্ধাপরাধী ... ইত্যাদি।

৪.খ.(১৫) মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন দলিলপত্র*, ঢাকা : অনন্যা, ২০২১

২০১১ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্রের পরবর্তী খণ্ড হচ্ছে

আলোচ্য গ্রন্থটি। উভয় গ্রন্থ সংকলনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল 'মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বৈচিত্রময় দিক নিয়ে গবেষণার উৎসাহ সৃষ্টি ও অপরিচিত দলিলপত্রের ব্যবহার'। এখণ্ডে ২২টি দলিল সংকলিত হয়েছে। দলিলগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ :

রওশন আরা কাহিনি; পোল্যান্ডকে ভুলে গেলাম কীভাবে?; ভবানী সেনের দলিল; সিপিআই এর প্রস্তাব; একাত্তরের সাহিত্য; প্রথম ইস্তাহার; যাদের অবদান স্মরণ করা হয় না; পিকিং মস্কো ও বাংলাদেশ; Maulana Bhasani's...; নিয়াজীর চিঠিতে গণহত্যার নীলনকশা; শান্তি কমিটির কাজ কারবার; বাংলাদেশের প্রথম বাস সার্ভিস; বাংলাদেশ বিষয়ে সত্য; বিশ্ব গণমাধ্যমে মতামত; গণহত্যার কালো বই; আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ; মার্কিন কংগ্রেসের শুনানি; ত্রিপুরার স্বাধীকার; আমার দেশ; গেরিলা; অঁরি লেভির বাংলাদেশ দর্শন; বিজ্ঞাপন-লটারিতে বাংলাদেশ।

৪.খ.(১৬) মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ : একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ*, ঢাকা : মাওলা ব্রদার্স, ২০২১

মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশের একমাত্র গবেষক যিনি মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর্যালোচনামূলক ইতিহাস যেমন লিখেছেন (যেমন : *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*), তেমনি শান্তি কমিটি, আলবদর, রাজাকার, বীরাঙ্গনা, পাকিস্তানি জেনারেলদের ভূমিকা, গণহত্যা-নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ওপর ৫০০০ এরও বেশি গ্রন্থ রচিত হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায়, যা তাঁর নজর এড়ায়নি। তা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক অবদান। এই শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি লিখেছেন *মুক্তিযুদ্ধ : একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ*।

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় সাহিত্যিকরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন অক্লান্তভাবে। **১৯৭১** সালের মার্চ থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক লেখক-কবি-শিল্পীরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য পথে নেমে পড়েছিলেন। ঐ সময় কলকাতার পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে খুব কমই লেখা হয়েছে। কিন্তু **১৯৭১** সালের পর তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব কমই লিখেছেন। মুনতাসীর মামুন সাহিত্যকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একাত্তরের সাহিত্য অভিধা দিয়েছেন। একাত্তরের সাহিত্যের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ভাবনা' নামক একটি ধারারই সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রন্থটির দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে তিনি একাত্তরের সাহিত্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পর্বে আছে বাংলা সাহিত্যে যারা পরিচিত তাদের লেখা ও কবিতার সংকলন। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছিল। মুনতাসীর মামুন মন্তব্য করেছেন '১৯৭১ সালের আগে বা পরে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

মুনতাসীর মামুনের এই সংকলন গ্রন্থের জন্য গদ্য-পদ্য সংগ্রহ করেছেন *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, *কালান্তর ও যুগান্তর*, *সাপ্তাহিক দেশ* ও দর্পণ *এবং মাসিক পরিচয় ও নবজাতক* থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের লেখক ছাড়াও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের শরণার্থী কয়েকজন লেখক ও নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন, বিশেষ করে আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক দেশ-এ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোলাম মুরশিদ (হাসান মুরশিদ নামে লিখতেন), আবদুল গাফফার চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, এম.আর. আখতার মুকুল প্রমুখ। তাঁদের লেখাও আলোচ্য গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন সংকলন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২৬টি বাংলা বই ও ২১টি ইংরেজি বইয়ের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। [পৃ. ৮২-১০৫]

১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার/বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১১টি বাংলা বই ও ২২টি ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছিল (তালিকা দ্রষ্টব্য পৃ. ১০০-১০২; ১০৫-১০৮)। সেসময় ভারত সরকার কর্তৃক কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল। সেরকম ১৩টি বইয়ের তালিকা (পৃ. ১০৮-১১০) আলোচ্য গ্রন্থে আছে। দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ৫৬টি ইংরেজি বইয়ের তালিকাও আছে (পৃ. ১১০-১১৭)। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত ১১টি বইয়ের নামও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (পৃ. ১১৭-১১৯)। ৪টি লিটল ম্যাগাজিনের উল্লেখও দেখা যায় (পৃ. ১১৯-১২০)।

আলোচ্য গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন সংকলনগুলো স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, বিশেষ রচনা, সংকলন ভাষ্য, সংকলন প্রতিবেদন, সংকলন কবিতা ও সংকলন বিতর্ক— ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন।

এক কথায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আকর গ্রন্থ। সাধারণ পাঠক জানবেন মুক্তিযুদ্ধের এক অজানা দিক। আর গবেষকরা পাবেন গবেষণা উপাদান।

৪.খ.(১৭) মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ *আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৮

২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক ডিক্লাসিফাইড বা অবমুক্তকৃত গোপন দলিলপত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের

অনেক তথ্য সন্নিবেশিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থটি হচ্ছে ঐসব 'মূল দলিল ও নথিপত্র অবলোকন ও পাঠের মাধ্যমে একাত্তরের 'অফিসিয়াল ওয়াশিংটনের' অন্দর মহলের দৃশ্যপট ও ঘটনাপ্রবাহ উপলদ্ধির চেষ্টা'। লেখক সমকাল পত্রিকায় ৬৪ কিস্তি এবং প্রথম আলো পত্রিকায় ১৬ কিস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবমুক্তকৃত দলিলপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই সংকলন। পত্রিকায় প্রকাশের সময় দলিলপত্রের যেসব শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছিল, সংকলিত গ্রন্থেও তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সেসব শিরোনাম থেকে দলিলপত্রের প্রকৃতি জানা সম্ভব বিধায় এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য শিরোনাম উদ্ধৃত করা হলো:

'মুজিব বাংলাদেশের জনক-সিআইএ', 'বাংলাদেশ কারো তাবেদার হবে না: মুজিব', 'নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সাজানো যুদ্ধের মহড়া', 'মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক: সিআইএ পরিচালক', 'ভূট্টো এক ভয়ঙ্কর বেজন্মা: নিক্সন', 'মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর', '৭ মার্চের ভাষণ শুনতে ওয়াশিংটনের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা', 'মুজিব নিয়েছিলেন গান্ধীর পথ: কিসিঞ্জার', 'মোশতাকের গোপন মিশনের চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্ত', 'মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপে পীড়াপীড়ি', 'ইয়াহিয়া আগেই জানতেন যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য', 'মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিতে কোসিগিনের আশ্বাস', 'পাকিস্তানীরা গর্দভ, ভারতীয়রা ধূর্ত: নিক্সন', 'দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা', 'ভাবতেই পারিনা মুজিব মৃত: কিসিঞ্জার', 'মুজিবের মুক্তিতে কিসিঞ্জারের হস্তক্ষেপ', 'আমার দেখা অন্যতম নিষ্ঠুর অপারেশন', 'মুজিব বিচ্ছিন্নতাই বেছে নিতেন', সিআইএ যে কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয়নি', 'চীনের ভূমিকায় কিসিঞ্জারের সংশয়', 'চীনা হুমকি ছিল কল্পনা?', 'মার্কিন ও সোভিয়েট নৌবহরের সমরসজ্জা', 'বাংলাদেশ এড়াতে কিসিঞ্জারের কৌশল' ...। গ্রন্থের শেষে মুল দলিলের কিছু ফটোকপি এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ছবি সংযোজিত হয়েছে।

৪.খ.(১৮) এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫

গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্ট দলিলপত্রের সংকলন না হলেও এতে সংকলিত বিভিন্ন তথ্য মুক্তিযুদ্ধের দলিল হিসেবেই গবেষকদের কাজে লাগবে। গ্রন্থটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নেতৃস্থানীয় প্রায় ৩,৫০০ জন ব্যক্তির অবস্থান (মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁরা কে কোথায় এবং কি কাজে নিয়োজিত ছিলেন) চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট চার পর্বে বিভক্ত এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ২৫শে মার্চ (১৯৭১) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল

রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে কর্মরত সদস্যদের নাম পদবী, পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং, জাতি পরিচয়, কর্মস্থলের নাম এবং তাঁদের মধ্যে যারা ২৫শে মার্চের পূর্বে অপসারিত, ২৫শে মার্চে নিহত, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি-প্রভৃতি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য- যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের নাম, পদবী ও দায়িত্বস্থলের তালিকা দেয়া হয়েছে। মুজিবনগর সরকারে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকারীদের নাম ও পদবীও উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য তালিকা নিম্নরূপ:

মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন সেক্টর ও সাবসেক্টরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, বিভিন্ন ব্রিগেডে দায়িত্ব পালনকারী অফিসার, বিভিন্ন যুব শিবিরে দায়িত্ব পালনকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, সেবক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা, নৌ প্লাটুন, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনী (কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী) প্রভৃতিতে কর্মরত কমান্ডার/কর্মকর্তাদের তালিকা ও পরিচয়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ, সংবাদ পাঠক, সংগীত ও নাট্য শিল্পী, কথিকা পাঠক প্রমুখের নামের তালিকা, জয়বাংলা পত্রিকায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গের পরিচয়, বর্হিবিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকবৃন্দের নাম, তাদের সংস্থার নাম ও ঠিকানা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জনসংযোগ কর্মকান্ড, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়বৃন্দের তালিকা ও প্রীতিম্যাচের বিবরণ, বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীর তালিকা, চলচ্চিত্র শিল্পীদের তালিকা, বাংলাদেশ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী পরিষদের তালিকা, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি-অবাঙালি অফিসারদের তালিকা, উর্দ্ধতন বেসামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা (পদবী ও কর্মস্থল এর উল্লেখসহ), কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা (পদবী ও কর্মস্থসহ), বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের তালিকা (পদবী ও কর্মস্থলসহ), সামরিক আদালতে কর্মরত বাঙালি সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি অফিসার (পদবী ও কর্মস্থলসহ), পাকিস্তান সামরিক সারকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী ১৯৭০-এ নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য তালিকা, সামরিক সরকারকে সমর্থনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তালিকা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী তালিকা (দলীয় পরিচয় ও নির্বাচনী এলাকার উল্লেখসহ), রাজাকার কমান্ডারদের নামের তালিকা (কর্মস্থলসহ), শান্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা (পদ ও নিয়োগস্থলসহ), সামরিক সরকারকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তালিকা (দলের নামসহ), ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের লীগবিরুদ্ধ অর্জনে ব্যর্থ ব্যক্তিদের নামের তালিকা (পদ, পেশা, পদবী ও সংগঠনের নামসহ), মুক্তিযুদ্ধের সময় জনযুদ্ধে নিহত ও বন্দী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দের তালিকা (নাম, ইউনিট, সেনানিবাস, মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি তথ্যসহ), মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দৈনিক ও মাস হিসেবে ভারতে শরণার্থী প্রবেশের হিসাব, মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সামরিক কাঠামো ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডারদের তালিকা, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় চাকুরীরত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (পদ ও কর্মস্থলসহ), মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টান ব্যক্তিদের তালিকা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ খ্রীষ্টান ব্যক্তিদের তালিকা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সেনা অফিসারবৃন্দের তালিকা, পাকিস্তান সামরিক বন্দীশিবিরে আটক কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা, বন্দীশিবিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তালিকা, বন্দীশিবিরে পেশাজীবী শ্রেণী, বন্দী সামরিক কর্মকর্তা ও সামরিক কর্মকর্তাদের গৃহিনীদের তালিকা, শহীদ রাজনীতিবিদগণের তালিকা, শহীদ বেসামরিক অফিসারবৃন্দের তালিকা, শহীদ সাংবাদিকগণের তালিকা, শহীদ চিকিৎসকগণের তালিকা, শহীদ প্রকৌশলীগণের তালিকা, শহীদ শিক্ষকবৃন্দের তালিকা, মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তালিকা।

৪.খ.(১৯) এএসএম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা*, ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯

১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারি জারিকৃত বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ এর আওতায় আটককৃত দালালদের নামের তালিকা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৪.খ.(২০) মেজর রফিকুল ইসলাম (সংকলিত), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: ঐতিহাসিক ভাষণ, ইশতেহার ও চিঠি*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭

এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে সকল দলিল সংকলিত হয়েছে তা' নিম্নরূপ:

১. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ।
২. মার্চ মাসে (১৯৭১) জারীকৃত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ঘোষণা ও নির্দেশাবলী।
৩. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা।
৪. মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ।
৫. স্বাধীনতার সনদ (১৭.৪.১৯৭১ তারিখে ঘোষিত)।

৬. প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ।
৭. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক ৩১.৩.১৯৭১ তারিখে লোকসভায় উপস্থাপিত প্রস্তাব।
৮. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নিকট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর লিখিত একটি পত্র (বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত)।
৯. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের দলিল।

৪.খ.(২১) সৈয়দুজ্জামান রওশন, *১৯৭১: ঘাতক-দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি*, ঢাকা: আফছার ব্রাদার্স, ১৯৯৩

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী জামায়াতে ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ, পিসকমিটির নেতা-কর্মীবৃন্দ আলবদর, আলশামস-এর সদস্যবৃন্দ তথা পাকিস্তানী বাহিনীর সমর্থনকারীদের যুদ্ধাপরাধ প্রমান করার জন্য সেসময় তাদের প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আলোচ্যগ্রন্থে সে ধরণের বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংকলিত হয়েছে। যাদের বক্তৃতা-বিবৃতি সংকলন করা হয়েছে তারা হলেন:

অধ্যাপক গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আব্বাস আলী খান, মওলানা আব্দুল মান্নান, হামিদুল হক চৌধুরী, এ.এস.এম. সোলায়মান, হাফেজ্জী হুজুর, শাহ আজিজুর রহমান, বিশুধানন্দ মহাথেরো, আয়েন উদ্দিন, আব্দুল মতিন, মওলানা আবদুর রহিম, এ.এন.এম. ইউসুফ, কাজী আবদুল কাদের, অংশু প্রু, ডা. এম. মালেক প্রমুখ।

৪.খ.(২২) Biswas, Sukumar (collected and compiled), *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents, 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005.

এই গ্রন্থটিতে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন দলিলপত্র সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, বিশ্ব জনমত গঠন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সংগে যোগাযোগ স্থাপন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব মুজিবনগর সরকারের। এই সরকারের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে (১০.৪.১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন পর্যন্ত (১৬.১২.১৯৭১) অসংখ্য দলিলপত্র সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য সেসব দলিলপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিলপত্রের ১৫টি খন্ডের মধ্যে তিনটি খন্ডে মুজিবনগর প্রশাসনের মোট ৩৩০০ পৃষ্ঠা দলিলপত্র সংকলিত হয়েছে। তার সংগে ড. সুকুমার

বিশ্বাসের এই সংকলন গ্রন্থটি সংযোজিত হ'লো। এর অধিকাংশ দলিল ইংরেজি ভাষায় লিখিত। দলিলপত্রগুলি ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যেমন: (১) বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি, (২) মুজিবনগর সরকারের বহি: প্রচার বিভাগ প্রকাশিত জার্নাল - *বাংলাদেশ* - থেকে সংকলন, (৩) মুজিনগর সরকারের উপর বর্হিবিশ্বের পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, (৪) দলিলপত্রের কপি ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ছবি। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলের শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা হ'লো:

Maulana Bhasani Appeals to world leaders (24.4.1971)

Bangladesh Prime Minister's Broadcast to the Nation (13.6.71)

Acting President of Bangladesh on US Arms Supply to Pakistan (23.6.71)

Acting President's Appeal Secure the release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (21.7.71)

Bangladesh Reacts US observers in Bangladesh (2.8.1971)

Pakistans White Paper - A write Lie (6.8.71)

Get Release of Bangabandhu and Family: Syed Nazrul's Call to world Powers (10.8.71)

Bangladesh Intellectuals Appraised Senator Kennedy about situation Inside Bangladesh (12.8.71)

Bangladesh Delegation to UN (21.9.71)

Acting President Appeals for UN Secretary General's Intervention (4.11.71)

৪.খ.(২৩) Liberation War Museum, *1971: Documentation on Crimes against Humanity Committed by Pakistan Army and their agents in Bangladesh during 1971*, Dhaka: Liberation War Museum.

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামী দলের নেতা-কর্মী, আলবদর, আলশামস, রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির দালালগণ যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন সংঘটিত করেছে সে সংক্রান্ত বিভিন্ন

দলিলপত্র এ গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। সংকলিত দলিলপত্রগুলো হচ্ছে:

1. Hamoodur Rahman Commission Report (Supplementary) (pp. 32-122).
2. Opposition Leader Sheikh Hasina's Parliamentary Speech, given on 16th April 1992, on the subject of Golam Azam and the public tribunal (pp. 136-145).
3. Universal Declaration of Human Rights (153-158).
4. A Partial transcript of the tape recording of some conversations between some of the Pakistani Army Units operating in Dacca on the night of March 25, 1971 (pp. 161-174).
5. List of the War Criminals belonging to the Pakistan Military Forces (pp. 175-182),
6. Photographs from the killing Field Where Pakistan Army along with their agents killed hundreds and thousands of innocent Bengalis, (pp. 182-192),
7. Article :
   (i) Ahmed Ziauddin, 'What is to be done About the Pakistani War Criminals and Collaboratars,' (pp. 201-208)
   (ii) M. Maniruzzaman Mia, 'Violation of Human Rights and Genocide in Bangladesh', (pp. 209-215),
8. The Leading Collaborators of 1971 and their Present where about (pp. 232-241),
9. Tears of Fire (Narration from the Documentary by Sentu Roy related in the 1971 Genocide in Bangladesh committed by Pakistan Army and the agents. The excerpts are from the interviews with international journalists, activists and expatriate who were witness to the Genocide, (pp. 242-248),
10. Unearthing of the killing Fields in Mirpur Dhaka and Excavation & Exhuming of other Sites for Identifying, Examining and Determining the Evidence to Prove the Genocide Committed in 1971 by Pakistan Army and Their Agents (pp. 249-251),
11. Dr. M.A. Hasan, '71 Massacre in Bangladesh and the Fallacy in the H.R.C. Report'. (pp. 261-270),
12. Excerpts from various books related to 1971 by important players of that time. (pp. 271-296).

৪.খ.(২৪) Arefin A.S.M. Shamsul, *Bangladesh Document 1971*, 4 Volumes, Dhaka, Bangladesh Research and Publications, 2009.

এটি মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। চারখন্ডে সংকলিত দলিলপত্রগুলি ইংরেজি ভাষায় এবং এসব দলিলের উৎস বাংলাদেশ ও ভারতসহ সারা বিশ্ব। যদিও কিছু দলিলপত্র হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিলপত্রের পনের খন্ডেও সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু সেই খণ্ডগুলি দিনে দিনে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে বিধায় তার পুন:প্রকাশের গুরুত্ব আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ১৯০৫ থেকে ২৬.৩.১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রের মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু দলিল সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড মুজিবনগর সরকারের নথিপত্র। তৃতীয় খন্ডে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে পূর্ব পাকিস্তানের দখলদার সরকারের কর্মকাণ্ডের নথিপত্র এবং চতুর্থ খন্ডে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক পুনর্গঠন, সশস্ত্র বাহিনী গঠন, রক্ষীবাহিনী গঠন, দালালদের বিচার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে দলিলপত্র সংকলিত হয়েছে।

৪.খ.(২৫) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক দলিলপত্র*, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৬।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত পনের খণ্ডে স্বাধীনতার দলিলপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। বিএনপির শাসনামলে (২০০১-২০০৬) এর বিতর্কিত পুনর্মুদ্রণ হয়। আওয়ামী লীগ শাসনামলে (২০০৮-) তার প্রচার ও প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। বিএনপির উক্ত শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ এবং সকল ফোর্সের অবদান সম্পর্কিত একটি ব্রিগেডভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ২০০৬ সালে ১১ খণ্ডে সেক্টরভিত্তিক

দলিল পত্র প্রকাশিত হয়। দলিলপত্র গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম লিখেছেন—

ইতিহাস গ্রন্থে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি, সেক্টর এলাকার বর্ণনা, সেক্টর ম্যাপ ও সাব-সেক্টর কমান্ডারদের নাম, সেক্টর এলাকার সামরিক গুরুত্ব, সেক্টরের সাংগঠনিক কাঠামো, প্রাথমিক প্রতিরোধ, সাব-সেক্টরভিত্তিক সংগঠিত যুদ্ধ, সাব-সেক্টর এলাকা বহির্ভূত যুদ্ধসমূহ, চূড়ান্ত যুদ্ধ ও বিজয় এবং পরিশিষ্টে যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, সেক্টর সম্পর্কিত বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ, সেক্টরে খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি রয়েছে।

৪.খ. (২৬) *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০১২-২০১৩ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ' (Encyclopediea of Bangladesh War of Liberation) রচনা ও প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়কাল ২০১৪ সালের মে থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। ২০২০ সালে ১০ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ প্রকাশিত হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়ার ফরম্যাট অনুসরণে মুখ্যত এন্ট্রিভিত্তিক বর্ণমালার ক্রমানুসারে বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষের খণ্ডসমূহ সাজানো হয়েছে। তবে, এতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কতিপয় বিষয় নিবন্ধ আকারে স্থান পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে উপজেলাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়ে দেশের ৪৯২টির সবকটি উপজেলার ওপর সেখানকার মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি/প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিজয় অর্জন পর্যন্ত সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরে পৃথকভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ২৪২১টি বিশেষ ভুক্তি, ৬০৯ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, ২০৪ জন মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিদেশী বন্ধু ও ১১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী, ১১৩টি নিবন্ধ, ৫ শতাধিক মানচিত্র, ২৬১৮টি আলোকচিত্র, স্থানীয় বাহিনী, মুজিব বাহিনীর ৪ প্রধান, সকল সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধকালে বেসামরিক প্রশাসনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিষদসমূহের সকল চেয়ারম্যানের ওপর সচিত্র ভুক্তি এ জ্ঞানকোষে রয়েছে। অধিকাংশ উপজেলার যুদ্ধকালীন প্রধান ঘটনাবলী, যেমন হানাদার বাহিনীর বন্দিশিবির ও নির্যাতনকেন্দ্র, গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইত্যাদির ঘটনাস্থল উপজেলার মানচিত্রে নির্দিষ্ট প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫. স্মরণিকা-বার্ষিকী, জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান

স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করে। প্রশাসনের উদ্যোগেও স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এসব স্মরণিকায় মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন ও সাময়িকীতেও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি প্রকাশ করে। বিশেষ দিবসে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এসব মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজশাহীস্থ হেরিটেজ আরকাইভসে কিছু স্মরণিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ রাজশাহী জেলার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মরণিকার একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

৫.ক রাজশাহী: পত্রিকা ও স্মরণিকা[৩]

মাহতাব উদ্দিন, *একাত্তরের জবানবন্দি*, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৮।

রণাঙ্গন একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮১।

রক্তাক্ত কারাগার ১৯৮৭, শহীদ কামরুজ্জামান স্মৃতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ।

উন্মেষ (বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক কমান্ড, রাজশাহী, ২০০১।

সূর্য সেনালী বিজয় দিবস সংকলন, ৪র্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৯৮৯, রাণীনগর সমাজ কল্যাণ সমিতি, রাজশাহী।

মুক্তি, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০০, মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ২য় সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ১৯৯৫।

রক্তিম শপথ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৫, বিজয় দিবস স্মারণে, উদীয়মান সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী।

বাংলার স্বাধীনতা বাঙালির স্বাধীনতা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রাজশাহী, ১৯৯৮।

বিজয় যান, এস.এম. যুব সংঘ, রাজশাহী, ১৯৯০।

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা মিছিল, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৮০, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংখ্যা, রাজশাহী।

উত্তর নক্ষত্র, স্বাধীনতা দিবস ১৯৯০, রাজশাহী।

চির-উন্নত মম শির, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১০, ধানসিড়ি, বোসপাড়া, রাজশাহী।

রক্ত নিশান, বিজয় দিবস ও ঈদ সংখ্যা, সৃষ্টি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী, ২০০২।

শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা দিবসমালা ১৯৯৭, রাজশাহী।

দ্রোহ, বিজয় দিবস ২০০০, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, রাজশাহী, ২০০২।

বিজয় কেতন, ২০০৫, বিজয় কেতন, রাজশাহী।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানিক কমান্ড, রাজশাহী। উন্মেষ, ২০০০-২০০১।

দৃষ্টি, বিজয় দিবস সংখ্যা, পুঠিয়া শিল্পী ও সাহিত্য সংখ্যা।

মহান বিজয় দিবস স্মরণে, গুনীজন সংবর্ধনা, নিক্কন নৃত্য শিল্পীগোষ্ঠী, রাজশাহী।

সূর্যোদয়, বিজয় দিবস ২০১১ ও জেলহত্যা দিবস স্মরণে, মেট্রোপলিটন প্রেস, ক্লাব, রাজশাহী।

২য় বীর শ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ১৯৯৭, রাজশাহী।

স্বাধীনতার তিন দশক, বেসামরিক প্রমাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, রাজশাহী, ২০০১।

অঙ্কুর, ঈদ ও বিজয় সংখ্যা ২০০০, ২০০১, অন্বেষা ইনফরমেশন ফর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট, ২০০২, ফুলকুড়ি আসর, রাজশাহী মহানগর।

মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার সম্মাননা স্মরণিকা ২০০৭, শিলমাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

মহান স্বাধীনতা দিবস তানোর সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলী ২০০১, তানোর সমিতি, রাজশাহী।

মালঞ্চ, শহীদ দিবস সংখ্যা, রাজশাহী, ১৯৯২।

বিজয় দিবস, রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব, রাজশাহী, ১৯৯৯।

জননী জন্মভূমি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমান্ড, রাজশাহী সেনা ইউনিট ১৯৯৭।

Mercury, বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৪, Northern University.

ঐশ্বর্য, স্বাধীনতা দিবস ২০০২, রাজশাহী।

দুর্জয়, আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠী, রাজশাহী, ৩১তম স্বাধীনতা দিবস।

জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, রাজশাহী স্বাধীনতা ১৯৯৬।

সবারে করি আহবান বিজয় দিবস ২০১০, প্রতীক্ষা শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহী।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ২০০৯, কাঁকন হাট, পৌরসভা।

তপন, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৯৬, জাতীয় তরুন পার্টি, রাজশাহী জেলা।

বিস্ফোরণ, বিজয় দিবসের বিশেষ প্রকাশনা, ২০০৬, রাজশাহী এ্যামেচার বডি বিল্ডার্স এসোসিয়েশন, রাব্বা, রাজশাহী।

ঐশ্বর্য, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, ২০০২, রাজশাহী।

কমল, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৮১, জিয়া পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, রাজশাহী।

মুক্তি, মুক্তিযোদ্ধা, সম্মেলন, ১৯৮৭, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, রাজশাহী।

মুক্তিযুদ্ধের বাঙলা, রাজশাহী, ২০০৯।

অভ্যুদয় বাংলাদেশ, মহান বিজয় দিবস ৪১ তম বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক স্মরণিকা ২০১২, সারাংপুর প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত, রাজশাহী।

৫.খ গাইবান্ধা জেলার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মরণিকা (২০০০ সাল পর্যন্ত তথ্য)

স্মরণিকা, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কি ধরণের তথ্য ছাপা হয় তার নমুনা হিসেবে গাইবান্ধা জেলা সম্পর্কিত তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো[৪] :

৫.খ (১) মাহমুদল হক শাহাজাদা (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধা*, পূর্বপাড়া, গাইবান্ধা, ২৬ মার্চ ১৯৮৪

৫.খ (২) আব্দুর রউফ চৌধুরী (সম্পাদিত), *একাত্তরের ধ্বনি*, ঢাকাস্থ গাইবান্ধা জেলা যুব সমিতি, ঢাকা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯,
এই স্মরণিকায়
মো. শফিক উল্লাহ, 'একাত্তরের স্মৃতিময় দিনগুলো'
এম.এন.এ. নবী লালু, 'একাত্তরের রণাঙ্গনের স্মৃতিময় দিনের কথা'-
মো. নজরুল ইসলাম, 'মুক্তিযুদ্ধে খায়রুল আলম কোম্পানী'
মবিনুল হক জুবেল, 'স্মৃতির পাতায় মুক্তিযোদ্ধারা'
মো. সামশুল আলম, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ'
মো. আবুল কাশেম চাঁদ, 'আমার চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ'

৫.খ (৩) *চেতনা* : 'শহীদ খন্দকার রোস্তম আলীর ২০ তম মৃত্যু বার্ষিকী

স্মরণে' *চেতনা*, গাইবান্ধা: আগষ্ট ১৯৯৬,
এই স্মরণিকায়
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'আমার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধে রোস্তম ভাই'
শাহাদত হোসেন লাকু, 'খন্দকার রোস্তম আলীকে যেমন দেখেছি'
আনছার আলী সরকার, 'আমার দৃষ্টিতে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা রোস্তম ভাই'
মো. নুরুল ইসলাম মন্টু, 'শহীদ খন্দকার রোস্তম লও সালাম'
লাসেন খান রিন্টু, 'বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সঙ্গে কিছু দিন'

৫.খ (৪) রাজিব হাসান বিপ্লব (সম্পাদিত), *যুদ্ধ দেখিনি*, গোবিন্দগঞ্জ: 'আমরা ক'জন' সামাজিক সংগঠন; এই স্মরণিকায়
রবিউল হাসান বিপ্লব, 'একাত্তরের দিনগুলিতে উত্তাল গোবিন্দগঞ্জ'

৫.খ (৫) *দীপ্ত শিখা* : বিজয় দিবস বুলেটিন, গোবিন্দগঞ্জ প্রেস ক্লাব, ১৯৯৪, এই স্মরণিকায়
মুহ. জোবাইদুর রহমান, " ২৭শে মার্চ/৭১ এর গোবিন্দগঞ্জ"
আব্দুল মতিন তালুকদার, ' স্বাধীনতা যুদ্ধে গোবিন্দগঞ্জ ছাত্রলীগের ভূমিকা ও আমার কথা'
শওকত জামান,' স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনা এবং অঙ্গিকার'

৫.খ (৬) হাবিবুর রহমান হবি (সম্পাদিত) *সৃষ্টি*, বিজয় দিবস সংখ্যা '৯৮, বামনডাঙ্গা: বামনডাঙ্গা রিপোর্টার্স ক্লাব।

৫.খ (৭) 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুবর্ণ জয়ন্তীতে গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের ইতিকথা', *আওয়ামী লীগের সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের ৫০ বছর*, রাজশাহী বিভাগীয় পুনর্মিলনী সমাবেশ '৯৯।

৫.খ (৮) জহুরুল কাইয়ুম, 'ভাষা আন্দোলনে গাইবান্ধা', বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গাইবান্ধা জেলা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত, *রক্তাক্ষর: মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রকাশন*, পৃ. ৬-৭।

৫.খ (৯) মো. রেজুওয়ানুল হক মন্ডল (সম্পাদিত), *ডাক দিয়ে যাই* (স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ স্মরণী '৯৭), ২৬ মার্চ ১৯৯৭। এই স্মরণিকায়-
– একাত্তরের স্মৃতি গাঁথা সাঘাটা এবং রোস্তম কোম্পানীর সাফল্য

৫.খ (১০) মাহমুদুল হক শাহাজাদা (সম্পাদিত) *মুক্তিযুদ্ধ*, পূর্বপাড়া, গাইবান্ধা, ১৬ ডিসেম্বর '৯৮,
এই স্মরণিকায়
ওয়াশিকার ইকবাল মাজু, ' একাত্তরের দিনলিপি', পৃ. আট-দশ

৫.খ (১১) ছামছুল হুদা মন্ডল (সম্পা.) *মুক্তি* (ধনারুহায় সমাহিত পাঁচজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে), ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩। এই স্মরণিকায়-
মো. হামিদুল হক সরদার, '৪ঠা ডিসেম্বরের ইতিকথা'
ছামছুল হুদা ও সাহাদত হোসেন, ' কাবেজ আলী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা'
আবু হোসেন দুদু, 'শহীদ আফজালের কথা'
মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, 'শহীদ বাদল'
মো. আব্দুর রাজ্জাক, 'চির অমর ওসমান গণি'
মো. জাকির হোসেন(ধলু) ' চির স্মরণীয় আবদুস সোবহান'

৫.খ (১২) মো. সামছুল আলম (সম্পাদিত), *মুক্তিসেনা* : মহান বিজয় দিবস সংকলন '৯৮, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮। এই স্মরণিকায়-
মো. শফিক উল্লাহ, 'স্মৃতির পাতায় রণাঙ্গন '৭১: একাত্তরের স্মৃতিময় দিনগুলো',
কাজিউল ইসলাম, '৭১ এ গাাইবান্ধা জেলার রণাঙ্গনের খতিয়ান'
মুহাম্মদ আতাউর রহমান,' গাইবান্ধার মুক্তিযুদ্ধ: কিছু স্মৃতি'
মো. নাজিম উদ্দিন, ' ইতিহাস কথা বলে ৪ ডিসেম্বর ফুলছড়ি মুক্ত হয়েছিল'
মো. বছির উদ্দিন,' মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা: ত্রিমোহনী ঘাটের যুদ্ধ'
৪ ডিসেম্বর '৭১ এর পাঁচজন শহীদের পরিচিতি'

৫.খ (১৩) মো. সামছুল আলম (সম্পাদিত), '*মুক্তিসেনা*, মহান স্বাধীনতা দিবস সংকলন '৯৯, সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৬ মার্চ, ১৯৯৯। এই স্মরণিকায়-
মো. বছির উদ্দিন, 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা: ত্রিমোহনী ঘাটের যুদ্ধ'

৫.খ (১৪) মো. সামছুল আলম (সম্পাদিত) *মুক্তিসেনা*, মহান বিজয় দিবস সংকলন '৯৯, সাঘাটা, গাইবান্ধা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

৫.গ পত্র-পত্রিকায় গাইবান্ধা জেলার মুক্তিযুদ্ধের তথ্য (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)
আজকের কাগজ

গৌতম চন্দ্র মোদক, 'ফুলছড়ির যুদ্ধ: ৪ ডিসেম্বর ফুলছড়ি হানাদার মুক্ত হয়', *আজকের কাগজ*, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।

গৌতম চন্দ্র মোদক, 'ত্রিমোহনী ঘাটের যুদ্ধ' *আজকের কাগজ*, ১লা নভেম্বর' ৯৩।

গোপাল মোহন্ত, 'শহীদের রক্তে মুক্ত গোবিন্দগঞ্জ', *আজকের কাগজ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৪।

আজাদ

'১৯৫৪ এর নির্বাচনী ফলাফল', *আজাদ*, মার্চ ১৪, ১৭, ১৯ এবং ৫ এপ্রিল ১৯৫৪।

'ভাষা আন্দেলনের খবর' *আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১ ও ১১ মার্চ, ১৯৫২।

নারী নির্যাতন বিষয়ে খবর, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

জনকণ্ঠ

মুহম্মদ হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক, 'উত্তর রণাঙ্গন: ঢাকা টু তেলঢালা ভায়া চাকুলিয়া' *জনকণ্ঠ*, মার্চ ১০-২৩, ২০০০।

মুহম্মদ হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক, 'কোন গোপন বার্তা ১১নং সেক্টরের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি' *জনকণ্ঠ*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

'মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বেসামাল পাক সেনারা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে পালিয়ে যায়' *জনকণ্ঠ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

গোবিন্দগঞ্জ পাকবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয় ১২ ডিসেম্বর, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, 'পঞ্চগড় ও গাইবান্ধা পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর দখলমুক্ত হলো আজ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

সালাহউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—ইতিহাস রচনার সমস্যা', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৬ মার্চ ১৯৯৭।

দৈনিক ইত্তেফাক

উইং কমান্ডার (অব) এম. হামিদুল্লাহ খান 'উত্তর রণাঙ্গন' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ পৌষ, ১৩৯৬।

'পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী ফলাফল', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ও ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

দৈনিক জনতা

নুরুজ্জামান প্রধান 'পলাশবাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিযুদ্ধের দিনটি নীরবে নিভৃতে চলে গেল' *দৈনিক জনতা*, ৫ মে ১৯৯৯।

গোবিন্দলাল দাস, 'গাইবান্ধার বধ্যভূমিগুলোর সংস্কার হয়নি' *দৈনিক জনতা*, ৫ মে ১৯৯৯।

নুরুজ্জামান সরকার, 'আজ পলাশবাড়ী মুক্তি দিবস,' *দৈনিক জনতা*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

দৈনিক বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গাইবান্ধা, 'আজ ফুলছড়ি মুক্ত হয়েছিল, *'দৈনিক বাংলা*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

'রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভুমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৯ জানুযারী ১৯৭২।

আমিনুল ইসলাম, 'কে কটা হত্যা করেন তার উপর নির্ভর করত খান সেনাদের পদোন্নতি', *দৈনিক বাংলা*, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

'জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে' *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

দৈনিক বাংলার বাণী

দেবাশীষ দাস দেবু, 'আজ গাইবান্ধা মুক্ত দিবস', *দৈনিক বাংলার বাণী*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

দৈনিক সংগ্রাম

রাজাকার বাহিনী বিষয়ে দেখুন, ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।

পূর্বদেশ

পূর্বদেশ প্রতিনিধি গাইবান্ধা,' ওরা গুলী করে.তো আর ছবি তুলতো', *পূর্বদেশ*, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

গোবিন্দ লাল দাস, 'অনেক নিষ্ঠুর হত্যার অসহায় দর্শক তিনি', *পূর্বদেশ*, ১৯ মার্চ ১৯৭২।

পূর্বদেশ সংবাদদাতা, 'গাইবান্ধার চিঠি, *পূর্বদেশ*, ২৩ মার্চ ১৯৭২।

পূর্বদেশ সংবাদদাতা, 'অসহযোগ আন্দোলনের খবর', *পূর্বদেশ*, ১০, ১১, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

নারী নির্যাতন বিষয়ে খবর, পূর্বদেশ, ১৯ মার্চ ১৯৭২।

প্রথম আলো

শাহাবুল শাহীন তোতা, 'শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, ঐতিহ্য, গাইবান্ধা', *প্রথম আলো*, ১৬ জুলাই ১৯৯৯; আরো দেখুন, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

বাংলা বাজার পত্রিকা

জহুরুল কাইয়ুম, 'ভাষা আন্দোলনে গাইবান্ধা', *বাংলা বাজার পত্রিকা*, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

ভোরের কাগজ
জহুরুল কাইয়ুম, 'গাইবান্ধায় অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ', ২০ নভেম্বর ২০০৩।

মুক্তকণ্ঠ
'আজ গাইবান্ধা হানাদার মুক্ত দিবস' *মুক্তকণ্ঠ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
গোবিন্দলাল দাস, '৭১ এর ২৪ অক্টোবর ত্রিমোহনী ঘাটে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন', *মুক্তকণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯।
গোবিন্দলাল দাস, '১২ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ হানাদার মুক্ত হয়', *মুক্তকণ্ঠ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

যুগান্তর
গাইবান্ধা প্রতিনিধি, 'গাইবান্ধার বধ্যভূমিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে' *যুগান্তর*, ৪ মার্চ ২০০০।

সংবাদ
মফিজুল হক তারা, 'গাইবান্ধায় মুক্তি এলো যেদিন', *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
মফিজুল হক তারা, 'গাইবান্ধার ঘাতকরা ছিল উন্মত্ত', *সংবাদ*, ৯ জানুয়ারী ১৯৯৪।
মফিজুল হক তারা, 'ভাষা আন্দোলনে গাইবান্ধা, *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।
মফিজুল হক তারা, 'গাইবান্ধার ৪১ হাজার কর্মী প্রশিক্ষণ নেন গোড়াতেই', *সংবাদ*, ৯ এপ্রিল ১৯৯৩।
মোনাজাত উদ্দিন, 'মুক্তিবাহিনীর পঞ্চাশ ভাগই ছিলেন কৃষক' *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২; আরো দেখুন, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা
(গাইবান্ধা জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ও ঠিকানার জন্য)
দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৭০-৮০।
তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩০-৩৬।
তৃতীয় বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা, ২৬ মার্চ ২০০০, পৃ. ৬৬।
তৃতীয় বর্ষ, ৪৫তম সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

৫.ঘ পত্রপত্রিকা (গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত)

দৈনিক ঘাঘট
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'ভাঙ্গামোড়ের এ্যামবুশ,' *দৈনিক ঘাঘট*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'ফুলছড়ির স্মৃতিতে অম্লান ৪ঠা ডিসেম্বর', *দৈনিক ঘাঘট*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'প্রসঙ্গ নৌকমান্ডো ফজলুল হক এখন ঠেলাগাড়ি চালান', *দৈনিক ঘাঘট*, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'এক উজ্জল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতিতে', *দৈনিক ঘাঘট*, ৭ এপ্রিল ১৯৯৯।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'অবহেলিত ফুলছড়ি বধ্যভুমি সংরক্ষণ ও সংস্কারের আবেদন, *দৈনিক ঘঘাট*, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০০।
'আজ সুন্দরগঞ্জ থানা হানাদারমুক্ত দিবস' *দৈনিক ঘাঘট*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
'আজ গাইবান্ধা থানা হানাদারমুক্ত দিবস' *দৈনিক ঘাঘট*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
'আজ গোবিন্দগঞ্জ থানা হানাদারমুক্ত দিবস' *দৈনিক ঘাঘট*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

দৈনিক সন্ধান
সন্ধান প্রতিবেদক 'পাখেয়া গ্রামের গণকবরে আজও কোন স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে উঠেনি', *দৈনিক সন্ধান*, ২২মার্চ ২০০০।
জহুরুল কাইয়ুম, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে গাইবান্ধা', *দৈনিক সন্ধান*, ৮ অক্টোবর ১৯৯২।
জহুরুল কাইয়ুম, 'গাইবান্ধার ভাষা সৈনিকদের স্মৃতিচারণ', *দৈনিক সন্ধান*, বিশেষ সংখ্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।
মো. কবির উদ্দিন চৌধুরী, 'রছুলপুর মানাস রেগুলেটর অভিযান', *দৈনিক সন্ধান*, ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ১৯৯৯।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'ত্রিমোহিনী ঘাটের যুদ্ধ', *দৈনিক সন্ধান*, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৪।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'একাত্তরে সম্মুখ যুদ্ধ', *দৈনিক সন্ধান*, ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯।
গৌতম চন্দ্র মোদক, 'আজ ফুলছড়ি মুক্ত হবার সেই দিন', *দৈনিক সন্ধান*, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩।
গৌতম চন্দ্র মোদক, '৮ ডিসেম্বর সাঘাটা হানাদার মুক্ত হয়', *দৈনিক সন্ধান*,

৮ ডিসেম্বর ২০০৩।
এনামুল কবীর রুপন, 'গাইবান্ধার শহীদ মিনারের ইতিহাস', *দৈনিক সন্ধান*, বিশেষ সংখ্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।
শাক্য সিংহ গোস্বামী, 'ঊনসত্তরের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে গাইবান্ধা', *দৈনিক সন্ধান*, ১৮ ও ২০ জানুয়ারী ২০০০।

দৈনিক জনসংকেত

'আজ গাইবান্ধা হানাদার মুক্ত দিবস', *দৈনিক জনসংকেত*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
'আজ গাইবান্ধা হানাদার মুক্ত দিবস পালিত', *দৈনিক জনসংকেত*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
'আজ গোবিন্দগঞ্জে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী', *দৈনিক জনসংকেত*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
'গাইবান্ধা থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-১', *দৈনিক জনসংকেত*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গাইবান্ধা থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-২', *দৈনিক জনসংকেত*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গাইবান্ধা থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৩', *দৈনিক জনসংকেত*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গাইবান্ধা থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৪', *দৈনিক জনসংকেত*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গাইবান্ধা থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৫', *দৈনিক জনসংকেত*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গোবিন্দগঞ্জ থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৬', *দৈনিক জনসংকেত*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গোবিন্দগঞ্জ থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৭', *দৈনিক জনসংকেত*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গোবিন্দগঞ্জ থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৮', *দৈনিক জনসংকেত*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গোবিন্দগঞ্জ থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-৯', *দৈনিক জনসংকেত*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
'গোবিন্দগঞ্জ থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-১০', *দৈনিক জনসংকেত*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

'পলাশবাড়ী থানার দালাল রাজাকারদের তালিকা-১২', *দৈনিক জনসংকেত*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

মাসিক গাইবান্ধা বার্তা

মাসিক গাইবান্ধা বার্তা, বর্ষ ১,সংখ্যা ১,এপ্রিল ১৯৯৭।

৫.ঙ পত্রপত্রিকা (বিবিধ)

দৈনিক করতোয়া

আজ গোবিন্দগঞ্জ মুক্তি দিবস, *দৈনিক করতোয়া*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
মনজুর কাদির মুকুল,' পলাশবাড়ী জনতার মানসপটে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা,' *দৈনিক করতোয়া*, ১২-১২-১৯৯৫।

৫.চ মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্র-পত্রিকায় গাইবান্ধার মুক্তিযুদ্ধের খবর

১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস গাইবান্ধা জেলা থেকে কোনরূপ সংবাদ বা সংবাদ বুলেটিন প্রকাশিত হয়নি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায়, কিংবা কলিকাতার পত্রিকাতেও গাইবান্ধার মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য খবরাদি খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ এই হতে পারে যে সে সময় গাইবান্ধায় কোন সাংবাদিক কর্মরত ছিলেন না। আমরা ৭১ এর পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করে তখন প্রকাশিত গাইবান্ধার মুক্তিযুদ্ধের কিছু খবরাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি। যে সকল পত্র পত্রিকায় গাইবান্ধার সংবাদ স্থান পেয়েছিল সেগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অগ্রদূত, ২০ অক্টোবর ১৯৭১, ১ ডিসেম্বর ১৯৭১।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে ১৯৭১।
মুক্তিযুদ্ধ, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।
বাংলার বাণী, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
বাংলাদেশ, ১ নভেম্বর ১৯৭১।
সংগ্রাম, ৫ আগস্ট ১৯৭১।

৬. গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয় তাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। এসব প্রবন্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদাহরণস্বরূপ এখানে 'বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী' থেকে প্রকাশিত *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ* শীর্ষক জার্নালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

সংখ্যা-১, ২০১৫

এ. কে. এম. জসীম উদ্দীন, 'মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া';
মীর ফেরদৌস হোসেন, '১৯৭১ সালে মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও হরিরামপুর থানার যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা';
মো. আনিসুর রহমান, ' বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম : কয়রোড থেকে কামালপুর';
দিব্যদ্যুতি সরকার, 'শর্মিলা বসু ডিসকোর্স ও চুকনগর গণহত্যা';
মিঠুন সাহা, 'মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় বাহিনী : যুদ্ধকালীন খুলনা বিভাগ';
শহীদ কাদের চৌধুরী, 'মুক্তিযুদ্ধের ১৩নং সেক্টর';
তপন কুমার পালিত, 'দক্ষিণ এশিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রথম বিচার'।

সংখ্যা-২, ২০১৬

জগন্নাথ বড়ুয়া, 'মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান : চট্টগ্রাম অঞ্চল";
তপন পালিত, 'মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : একটি কেস স্টাডি';
শহীদ কাদের চৌধুরী, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য সেবা';
সুস্মিতা রানী দাস, 'মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় বাহিনী বা ১৪নং সেক্টর : একটি কেস স্টাডি- পলাশডাঙ্গা যুবশিবির'।

সংখ্যা-৩, ২০১৬

আহম্মেদ শরীফ, 'বগুড়া ১৯৭১ : গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর';
তপন পালিত, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া : পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস';
মোঃ আনিসুর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধে শেরপুর : প্রসঙ্গ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অংশগ্রহণ';
আমিনুর রহমান সুলতান, '১৯৭১ : পাটগ্রাম মুক্তাঞ্চল';
মোশারফ হোসেন, '১৯৭১ সালে কুমিল্লা জেলার অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র';
মামুন তরফদার, 'টাঙ্গাইলের শহীদ বুদ্ধিজীবী';
আইরীন আহমেদ, 'মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালের গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে সোহাগপুরের বিধবাপল্লীর নারীদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা'।

সংখ্যা-৪, ২০১৭

এই সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোনো প্রবন্ধ ছিল না।

সংখ্যা-৫, ২০১৭

শহীদ কাদের চৌধুরী, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যকার চিকিৎসা সহায়তা';
পিয়াস মজিদ, 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা একাডেমি';
উৎস বড়ুয়া জয়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর অবদান : একটি পর্যালোচনা'।

সংখ্যা-৬, ২০১৮

জগন্নাথ বড়ুয়া, 'মুক্তিযুদ্ধে বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা : একটি গবেষণা পর্যালোচনা'।

সংখ্যা-৭, ২০১৮

এ. কে. এম. জসীম উদ্দীন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা : আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া';
হোসনে আরা খানম, 'একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভূমিকা';
মুর্শিদা বিনতে রহমান, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব';
আহম্মেদ শরীফ, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গণকবর : একটি পর্যালোচনা';
সুমা কর্মকার, 'নাটোর জেলার অনাবিষ্কৃত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর';
শহীদ কাদের চৌধুরী, 'মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা সহয়তা';
মো. মনিরুজ্জামান শাহীন, 'বরিশাল ১৯৭১ : গণহত্যার ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি';
সো. সালাউদ্দিন, '*রাইফেল রোটি আওরাত* : যুদ্ধদিনের সাহিত্যিক দলিল';
রেহানা পারভীন, 'স্বাধীন বাংলার প্রথম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সঙ্কলন : *হে স্বদেশ*'।

[চলবে]

তথ্যসূত্র

১. তালিকা 'গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি' শিরোনামে দেওয়া হয়েছে।
২. ঐ।
৩. দেখুন, মো. ইউসুফ, 'রাজশাহীস্থ হেরিটেজ আরকাইভসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা-৮, মার্চ, ২০১৩, পৃ. ১৭৩-১৯৩।
৪. মাহবুবর রহমান, *একাত্তরে গাইবান্ধা*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১২, পৃ. ২৩৬-২৪২।